কালের কণ্ঠ

তারিখ 27 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা

বড় চ্যালেঞ্জ লক্ষাধিক শিক্ষকের এমপিওভুক্তি

পরীক্ষুল আলম সুমন ▶

গত সরকারের সময় লক্ষাধিক শিক্ষকের এমপিওভুক্তির দাবি নিয়ে বিপাকে ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সংসদেও অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে একাধিকবার তোপের মুখে পড়তে হয় সংসদ সদস্যদের। বেসরকারি সব প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পর এমপিও না পাওয়া শিক্ষকদের ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। এসব শিক্ষকের এমপিওভুক্তি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা অর্থাভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্ধশতাধিক প্রকল্পের কাজ আটকে আছে।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন ছিল গত মেয়াদে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বড় সাফল্য। কিন্তু এ শিক্ষানীতির সামান্য অংশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় মন্ত্রণালয়কে। আবার শিক্ষা আইন প্রণয়ন নিয়েও মন্ত্রণালয়কে শিক্ষকদের তোপের মুখে পড়তে হয়। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মূল

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

বড় চ্যালেঞ্জ লক্ষাধিক

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও বিফলে যায়।

গত সরকারের শেষের দিকে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেশ কয়েকটি সংগঠন নানা দাবিতে রাজপথে ছিল। এদের মধ্যে নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট আন্দোলনে ছিল প্রায় সাত হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভুক্তির দাবিতে। তাদের আন্দোলনে পুলিশ তরল গ্যাস ও পিপার স্প্রে ছুড়ে জব্দ দিয়েছিল নতুন বিতর্ক। লাঠিপটা, কাঁদানে গ্যাস ছুড়েও তাদের রাজপথছাড়া করতে পারেনি পুলিশ। পিণপিরই তারা আবারও আন্দোলনে নামবেন বলে জানা যায়। ঐক্যজোটের সভাপতি অধ্যক্ষ মো. এশারত আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত সরকারের পাঁচ বছরেও আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়নি। লক্ষাধিক শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বর্তমান সরকার আগামী বাজেটে এমপিওভুক্ত না করলে রাজপথে কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলব।'

এমপিওভুক্তির বিষয়ে জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এটি নীতিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তারপরও শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে গেলে এখন নতুন এমপিওভুক্ত করাটা কষ্টকর। কারণ শিক্ষানীতিতে আছে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক এবং এরপর দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা হবে। এটা বাস্তবায়িত হলে কোন শিক্ষক প্রাথমিকে থাকবেন, আবার কোন শিক্ষক মাধ্যমিকে থাকবে তা নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হবে। আবার নতুন বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত হলে এ সমস্যা আরো বাড়বে। সব মিলিয়ে নতুন এমপিওভুক্তিতে বেশকিছু ঝামেলা রয়েছে। এরপরও এমপিওভুক্তি থেমে থাকবে না, অর্থ প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করবে। তবে সব বিদ্যালয়কে হয়তো করা সম্ভব হবে না।'

জানা যায়, অর্থ সংকট পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্ধশতাধিক উন্নয়ন প্রকল্প। ঠিকাদাররা কাজ করতে পারছেন না অর্থের অভাবে। যেটুকু কাজ করেছেন তারও টাকা পাচ্ছেন না তাঁরা। এ অবস্থায় প্রকল্পগুলো মুখথুবড়ে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। এমন অনেক প্রকল্প রয়েছে যেখানে চলতি অর্থবছরে কোনো বরাদ্দই দেওয়া হয়নি। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে ২০০০ বেসরকারি বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৮৯৫ কোটি ৩২ লাখ টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ দেওয়া হয় আট কোটি টাকা। কিন্তু ছাড় করা হয়েছে মাত্র দুই কোটি টাকা। কাজ করে ঠিকাদাররা তাগাদা দিলেও টাকা দিতে পারছেন না প্রকল্প পরিচালক। অথচ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ২০১৪ সালের জুন মাসে।

নির্বাচিত ৩০০০ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে দুই হাজার ১১৪ কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ দেওয়া হয় ৩০৯ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। কিন্তু ছাড় হয়েছে ১৫৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। এক হাজার নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য ২০১১ সালের জুলাই মাসে ৭৩৮ কোটি ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ দেওয়া হয় ৯০ কোটি টাকা। কিন্তু ছাড় হয়েছে ৪৫ কোটি টাকা। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত ১৫০০ কলেজের উন্নয়নের জন্য দুই হাজার ৩৮৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০১২ সালের জুলাই মাসে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৬৭২ কোটি ৪১ লাখ টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ৪৯৩টি কলেজের উন্নয়ন কাজের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। কাজ শুরু হয়েছে ১৭০টি কলেজের। এ জন্য দরকার কমপক্ষে ৩৫০ কোটি টাকা। অথচ দেওয়া হয়েছে মাত্র ৫৫ কোটি টাকা।

এ বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বরাদ্দই কম, তারপরও যেটা আছে সে অর্থও পাওয়া যাচ্ছে না। তাই শিক্ষার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের গতি কমে গেছে। তবে যেসব প্রকল্পের মেয়াদ শেষের পথে, সেগুলোতে দ্রুত অর্থ ছাড়ের ব্যাপারে চেষ্টা করছি। মন্ত্রণালয় থেকেও এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহায়তা করা হচ্ছে। অনেক প্রকল্পের জন্যই আগামী বাজেটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকায় তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না। আবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তাদের সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে ইউজিসিকে। এ জন্য ইউজিসিকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের সব কাজ শেষ করে আনলেও এ-সংক্রান্ত বিলটি সংশোধনের জন্য ফেরত পাঠানো হয় মন্ত্রিসভা থেকে।

সরকারি হিসেবে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার এবং শিক্ষার্থী প্রায় ২১ লাখ। কিন্তু বেসরকারি হিসাবে মাদ্রাসা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি। এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই সরকারের। এসব মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিতে গত বছর কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ জমা দেয়। কমিশনের সুপারিশে বলা হয়, পরীক্ষা হবে কেন্দ্রীয়ভাবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের স্বীকৃতির জন্য স্বতন্ত্র আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ করা হয়। পাঠক্রমে নতুন করে যুক্ত করা হয় শুধু বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়। এ চারটি বিষয় মিলে নম্বর হবে মাত্র ২০০। বাকি ৮০০ নম্বরের পরীক্ষায় আগের বিষয়গুলোই থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-সংক্রান্ত বিলটি পাস হয়নি। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মূল স্রোতের বাইরে রেখে কোনোভাবেই শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা।

গত সরকারের সময় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা অর্জনকারীদের পদবি 'সুপারভাইজার' করায় পলিটেকনিক কলেজগুলো ছিল উত্তাল। তারা পরীক্ষা বর্জনসহ কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলে। এ ছাড়া ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা মূলত দুই দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন। এসব দাবি মেটাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দফায় দফায় বৈঠক করলেও কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি।